ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 322- 328
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.231

উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে নারীর জীবনযাত্রা: প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘কঙ্কাবতী’

সুনন্দা ঘোষ, *গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত*

Received: 15.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The 19th century is considered the dawn of a new era. This century marked a turning point for women, who began to emerge from the darkness of ignorance and find the light of knowledge. The 19th century can also be termed a transitional period, as it was marked by both darkness and the emergence of modern thought. Women were victims of societal norms and customs, restricted by rules that governed their lives from birth to death. They were confined to the household and barred from participating in the outside world. Against this backdrop, Trailokyanath Mukhopadhyay created female characters in his works, depicting the struggles of women in society. In his novels and stories, such as "Kankabati", "Damru Charit", "Lallu", and "Birbala", he portrayed the image of oppressed women. Specifically, in "Kankabati", he highlighted the problems faced by women in the 19th century. Through Kankabati's character, Trailokyanath depicted the progress of women's education, the impact of child marriage on women's lives, the sufferings of widows, and the practice of Sati. He exposed the societal norms and customs that were the root cause of women's suffering. Society imposed strict rules and customs, dictating that women were the key to all good and evil. Women's education was seen as a threat to societal stability, and they were denied the right to education. Only men had access to education, while women were confined to their homes. Trailokyanath Mukhopadhyay's works shed light on the plight of women in a patriarchal society, trapped in a web of societal norms and customs. This discussion will explore how he portrayed the struggles of women in "Kankabati".

Keywords: Women’s Education, Social Customs and Oppression, 19th-Century Bengal, Patriarchal Society, Child Marriage

আমরা জানি সাহিত্যে রয়েছে সমাজের প্রতিফলন। এই প্রতিফলনের কোনো সীমা নেই। সমাজ যত এগিয়ে যাচ্ছে, যতবার যতরকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে, সাহিত্যে তার সবকিছুই ওঠে আসছে। সমাজের দুটি স্তম্ভ— নারী ও পুরুষ। এই দুই স্তম্ভের জীবনযাত্রার দোলাচলতা সাহিত্যের অন্যতম অংশ। বিশেষ করে নারীর জীবনযাত্রা। কারণ— উনিশ শতকে নারীর জীবনযাত্রা সহজ ছিল না। পুরুষ ও নারী সমকক্ষ তো ছিলই না, উল্টো পুরুষের শাসনে নারীকে চারদেয়ালের ভিতর আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। এমন প্রতিকূলতা থেকে উদ্ধার পেতে নারীর সময় লেগেছে অনেক। নারীর জীবন অনেকটা নদীর মতো, প্রতিটি বাঁক একটি করে আধুনিকতা উপহার দিয়েছে নারীকে। জীবনের প্রতিটি বাঁকে নানা রঙ দেখতে দেখতে গিয়েছে নারী ও পেরেছে কিছুটা শেকল-মুক্ত হতে। সাহিত্যের প্রতিটি শতক জুড়ে রয়েছে নারীদের জীবনযাত্রা, সংগ্রাম ও মুক্তির ছাপ। আমরা এখানে আলোচনা করব উনিশ

শতকের প্রেক্ষিতে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' উপন্যাস। এই শতকে নারী প্রায় আবদ্ধ-জীব। পরিবার কিংবা সংসারের চার-দেওয়ালের মধ্যেই ছিল নারীর বড় হয়ে ওঠার গল্প, তার কর্মজীবন ও সবটুকু। জীবনের শুরু ও শেষ বাড়ির গণ্ডির মাঝেই। যেখানে বাইরের শিক্ষা, উন্নত জীবনধারার আলো প্রবেশ নিষেধ। কারণ— আলোর আধিকার একমাত্র পুরুষদের। অন্যদিকে সংসার রক্ষা, স্বামী-সন্তান প্রতিপালন ছিল নারীর ধর্ম। খুব কম বয়সে নিজস্ব চাহিদা, বোধ জন্মাবার পুর্বেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো। ফলে নিজের রুচির উপর নির্ভর করে জীবন না কাটিয়ে স্বামীর সংসারে অন্যের হুকুমের দাসী হয়ে জীবন কাটাতে হতো। এমনকি কম বয়সে বয়স্ক লোকের সঙ্গে বিবাহ-পাশে আবদ্ধ হওয়ায়, অচিরে বৈধব্য ধারন করে নারী ভবিষ্যৎ কালবৈশাখীর অন্ধকারে ডুবে যেতো। এমনই এক বিস্ময়কর টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যাত্রা করা উনিশ শতকের নারী জীবনকে এঁকেছেন ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর কঙ্কাবতীতে।

'কঙ্কাবতী' আলোচনায় আমরা প্রথম দিকে রাখবো নারী শিক্ষার দিকটি। নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে জীবনে উন্নতির একমাত্র ধাপ শিক্ষা। তবে সমাজ শিক্ষা গ্রহনের স্বীকৃতি দিয়েছিল পুরুষদের। নারীর প্রবেশ এই জায়গায় ছিল একদম নিষেধ। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, নারী শিক্ষার বা শিক্ষামূলক উন্নতির গোঁড়ার কথা কেমন ছিল তা নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতে শিক্ষিত নারীর অভাব ছিল না। লক্ষণসেনের স্ত্রী, চৈতন্য যুগে সুভদ্রা দেবী, হেমলতা দেবী, উনিশ শতকের সূচনায় আনন্দময়ী দেবী প্রমুখ ছিলেন বিদ্যাবতী নারীদের তালিকায়, যদিও এই তালিকা আরো বড়। ধনী ঘরের, অভিজাত শ্রেনির মেয়েরা শিক্ষা গ্রহন করতে পারলেও, গ্রামের তৃণমূল স্তরের বিরাট অংশের নারীরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। পড়াশোনা করলে মেয়েরা উশৃঙ্খল হয়ে উঠবে, বিধবা হবে এমন উদ্ভট ধারনাগুলো নারীদের পায়ে শেকল পড়িয়ে রাখতো। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর 'কঙ্কাবতী'-তে দেখিয়েছেন— তনু রায় তার ছোটো মেয়ে কঙ্কাবতীকে লেখাপড়ার দিকে এগিয়ে দিতে চায় নি। তার মতে—

> "স্ত্রীলোকের আবার লেখাপড়া কেন? লেখাপড়া শিখিয়া আর কাজ নাই"[১]

বলা-বাহুল্য তনু রায় কঙ্কাবতীকে শিক্ষার দিকে এগিয়ে না দেওয়ার অন্যতম কারন ছিল সমাজ চাহিদার অভাব। নারী শিক্ষালাভ করে সমাজের উপকারে আসবে, এমন ভাবনা সেসময়ে কল্পনার অতীত ছিল। কচি বয়সে মেয়ে বিয়ে দিয়ে দায় সারা-ই ছিল তনু রায়ের লক্ষ্য। যদিও কন্যা দানের মাধ্যমে পাত্র পক্ষ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নেওয়ার লালসার কমতি ছিল না। তবুও বলা যায়— তনু রায় উনিশ শতকের সমস্ত মধ্যবিত্ত পিতার প্রতিনিধি, যাদের মতে নারী শিক্ষা একটি অবান্তর ভাবনা।

রূপকথার আদলে একটি ব্যাঙের মুখ থেকে সমসাময়িক সমাজমানসে স্ত্রী-শিক্ষার ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। ব্যাঙ বলছে—

> "ওগো তুমি যে মেয়েটি ভালো গো! ওগো লেখাপড়া শিখিয়া তুমি যে মদ্দামেয়েমানুষ হও নি গো"[২]

অর্থাৎ ব্যাঙের ধারনা কঙ্কাবতী শান্ত, লক্ষ্মীমন্ত হতে পেরেছে পড়াশোনা করেনি বলেই। নইলে মদ্দামানুষ হতে তাকে কেউ আটকাতে পারতো না। নারী নম্র, লজ্জাশীলা, ধীর হবে এমনটাই সমাজ প্রত্যাশা করে। শিক্ষা নারীকে এই গণ্ডিমুক্ত করবে ভয়ে সমাজ নারীকে চার-দেওালের বাইরে বেরতেই দেয় নি। ব্যাঙের এমন বিবেচনা তৎকালীন রক্ষণশীল মানসিকতারই প্রকাশ।

খেতু কঙ্কাবতীকে লেখাপড়া শিখিয়ে কলকাতার আচরণে দীক্ষিত করতে চায়। সে কলকাতা থেকে বই এনে কঙ্কাবতীকে পরাতে চাইলে, কঙ্কাবতীর মা স্বয়ং তাতে সোজাসুজি বাঁধা না দিলেও একবাক্যে উৎসাহ প্রকাশ করে নি। তার ভাষ্য—

> "আমাদের পাড়া গাঁ তাই, এখানে অসব নাই"[৩]

স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন শহরে কিছুটা ছড়িয়ে গেলেও, গ্রামে চলত পুরনো ভাবধারা। সেই ধারাকে ভেঙে নতুনকে বরণ করা সহজ ছিল না। কারণ ছিল সমাজে মেয়েদের পথ দেখানোর জন্য উপযুক্ত গৃহশিক্ষিকার অভাব ও পরিবারের লোকেদের নেওয়া যত্নের ত্রুটি। মেয়েদের শিক্ষার থেকে তাদের পাত্রে সমর্পণ করাটিই সেই সময়ের সমাজব্যবস্থার

নিয়ম ও লক্ষ্য ছিল। উনিশ শতকের মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টিকে নিয়ে তাদের বাবা-মায়েরা কতটা উদাসীন ছিল তা 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করতে পারি—

> "বাপ মায় লেখাপড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন যে ঘরের কার্য্য কর্ম্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘরকন্না কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্ম্ম দেয়াথোয়া শিখিলেই শ্বশুরবাড়ি সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছু কহেন না"[৪]

নারীর শিক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি যা 'সর্বশুভঙ্করী' পত্রিকায় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে—

> "প্রথম। শিক্ষা কর্ম্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি বৃত্তির আবশ্যক স্ত্রী জাতির তাহা নাই সুতরাং কন্যা সন্তানেরা শিখিতে পারে না।
>
> দ্বিতীয়। স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখন নাই, এবং শাস্ত্রেও প্রতিষিদ্ধ আছে; অতএব লোকাচার বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ ব্যাপার কদাচ অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে না।
>
> তৃতীয়। স্ত্রী লোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতি বিয়োগ দুঃখের ভাজন হইয়া চিরকাল কষ্টে জীবন যাপন করিবেক অতএব এতাদৃশ দৃষ্টদোষদূষিত বিষয় জানিয়া শুনিয়া পিতামাতা কেমন করিয়া প্রাণ সমান স্ব সন্তানকে এই দারুণ দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন"[৫]

স্ত্রী-শিক্ষার পাশাপাশি আমরা নারীর বাল্যবিবাহকেও নারীর অন্ধকার ভবিষ্যতের কারণ হিসেবে দাঁড় করাতে পারি। কারন বাল্যবিবাহ নারী শিক্ষা অন্তরায়ের অন্যতম কারন। বাল্যবিবাহের জন্যই সংসার প্রতিপালন করতে গিয়ে অল্প বয়সেই সংসার জালে আবদ্ধ হয়ে যেতো বা আবদ্ধ করানো হতো। যে সমাজে বিয়ে ছিল মেয়েদের একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে শিক্ষার স্থান বহুদূরে হওয়াই স্বাভাবিক। তনু রায় তার প্রথম দুই কন্যাকে কম বয়সে বয়স্ক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। এরপর কঙ্কাবতীর ক্ষেত্রেও একই কাজ করতে গেলে কঙ্কাবতীর মা বুড়ো বরের হাতে ছোটো মেয়েকে সমর্পন করতে রাজী হয় নি। ঈশ্বরের কাছে তার একমাত্র প্রার্থনা—

> "হে মা কালী! হে মা দুর্গা! হে ঠাকুর! যেন আমার কঙ্কাবতীর বরটি মনের মতন হয়"[৬]

বড় দুই মেয়ের বৈধব্য যন্ত্রণা তার কাছে মা হয়ে অসহনীয় ঠেকেছিল। তাই কঙ্কাবতীর ভাগ্য যাতে না পুড়ে, সেজন্যে ঈশ্বরের কাছে তার কাতর আর্তনাদ। এই আর্তনাদ বাল্যবিবাহের বিফলতার প্রতীক।

সমাজ চলে তার নিজের স্রোতে। নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমাজের পুরুষের পক্ষে মর্যাদায় আঘাত হানার সমান ছিল। বিবাহ যোগ্য কন্যা কিংবা পরিবারের অন্যান্য স্ত্রীলোকের মতামতকে সঙ্গে রেখে সে-সময়ের পুরুষ সমাজ চলত না। ফলে দেখা যায়— কঙ্কাবতীর মায়ের সমর্থন না থাকা সত্তেও তনু রায় গ্রামের বুড়ো জমিদারের সঙ্গে ছোটো মেয়ের বিয়ের পাকা কথা দেয়। এদিকে বুড়োর গলায় বরমালা দিতে হবে ভেবে আহার, নিদ্রা ত্যাগ করে জ্বরে মর-মর অবস্থা হয় কঙ্কাবতীর। এই প্রসঙ্গে খেতুর মার উক্তি—

> "কঙ্কাবতীর যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাই, কঙ্কাবতী আর অধিক দিন বাঁচিবে না"[৭]

তনু রায় এমন অবস্থাতেও মেয়েকে পাত্রস্থ করতে প্রস্তুত। নইলে জমিদারের থেকে পাওয়া মোটা অঙ্কের টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবে। তনু রায়ের এমন উদ্যোগ গোয়ালিনীর কাছে স্বাভাবিক মনে হয় না। গোয়ালিনী তনু রায়ের উপর রেগে যায়। কিন্তু তার এই ক্ষোভ সে প্রকাশ্যে আনে নি। উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষদের কোনো সিদ্ধান্তে নারীরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানাতে পারতো না। গোয়ালিনীর মতো সামান্য কর্মজীবি নারীদের পক্ষে তা আরও সম্ভব ছিল না। তাই মনে মনে গোয়ালিনী তনু রায়ের উপর ক্ষোভ উগড়ে বলে—

> "বাছা রে আমার! জনার্দন চৌধুরীকে এই সোনার বাছা বেচিতে চায়! পোড়ারমুখো বাপ! রও এইবার দেখা হইলে হয়! গালি দিয়া ভূত ছাড়াইব"[৮]

নিজের পিতার উপর গোয়ালিনীর এমন রাগ দেখে কঙ্কাবতী পিতার সমর্থন নিয়ে নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ হিসেবে পরিবারের অর্থনৈতিক দৈন্যতার দিকে ইঙ্গিত করে বলে—

> "না মাসী, বাবাকে গালি দিও না! জান তো মাসী? বাবা দুঃখী মানুষ! ঘরে অনেকগুলি খাইতে। আমাকে না বেচিলে, বাবা, সংসার প্রতিপালন কি করিয়া করিবেন?"[৯]

কঙ্কাবতীর মুখে 'বেচিলে' শব্দটি তৎকালীন মেয়ের সামাজিক অবস্থার করুণ পরিণতির দিকটিকেই প্রকাশ করে। নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা বা নিজের ইচ্ছার কথা ভেবে, পরিবারের অর্থনৈতিক সাহায্যের কথা ভেবে কঙ্কাবতী নিজের বিরুদ্ধে গিয়ে বুড়ো জনার্দনের গলায় মালা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার লক্ষ্য একটি— তার পরিবার যাতে দারিদ্রে না থাকে। যদিও তনু রায়ের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি করুণ নয়। স্বভাবের বশবর্তী হয়েই তার টাকার লোভ ও কৃপনতা।

ঘটনাচক্রে তনু রায়ের সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিয়ে ভেঙে যায়। বিয়ে ভেঙে যাওয়া মেয়েকে তৎকালীন সমাজ ভালো চোখে নিতো না। পরবর্তীতে মেয়েটিকে পাত্রস্থ করা কঠিন হয়ে পড়তো। তার একটি-ই ভয়—

> "এমন রাজা হেন পাত্রের সহিত তোমার বিবাহ স্থির করিলাম। তোমার কপালে সুখ নাই, তা আমি কি করিব? জনার্দন চৌধুরীকে কত বুঝাইয়া বলিলাম, কিন্তু তিনি আর বিবাহ করিবেন না। এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি? পঞ্চাশ টাকা দিয়াও কেহ এখন ইহাকে বিবাহ করিতে চায় না"[১০]

কৃপন তনু রায়, যে তার নিজের মেয়েদের বিবাহ নামক ব্যবসার রসদ হিসেবে ব্যবহার করে টাকা কামাতে চায়, সে-ই তনু রায় সমাজের চোখ থেকে রক্ষা পেতে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করে কঙ্কাবতীর বিয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু পাত্র পাওয়া কষ্টকর। তনু রায়ের চিন্তা—

> "এত বড় মেয়ে হইল, এখন ও মেয়ে লইয়া আমি করি কি? সুপাত্র ছাড়িয়া কুপাত্র মিলাও দুর্ঘট হইল"[১১]

ফলে কুলটা মেয়েকে ঘাড় থেকে নামাতে, কিংবা বলা যায় বেশি টাকার লোভে চতুষ্পদ প্রাণী বাঘের সঙ্গেই সুন্দরী কঙ্কাবতীর বিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় সে। তনু রায়ের মতে অধিক ধন-সম্পত্তির মালিক হলেই সুপাত্র হওয়া যায়। তাই একান্ত ধনের লোভে পড়েই বাঘের সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিয়ে ঠিক করে বসে তনু রায়। কোন প্রাণীকূলে তনু রায় তাকে পাত্রস্ত করবে কঙ্কাবতী তা জানত না। ফলে সুপাত্রের আশা করা তার কাছে বিলাসিতা মাত্র। অর্থাৎ লোভ, সম্মানহানির ভয়, পণ ইত্যাদি চাপাকলে মেয়েদের জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, উনিশ শতক যার পোক্ত দলিল।

নারীকে বাল্যবিবাহ নামক অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে ১৮৭৩ সালে ঢাকাতে 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' স্থাপিত হয়। 'বিদ্যোৎসাহিনী'-তে বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ে বলা হয়েছে—

> "বাল্যকালে বিবাহ হইলে হৃতবীর্যও হইতে হয়। তাহার প্রমাণ অস্মদ্দেশীয় লোকেরা প্রায়ই অন্যদেশীয় লোক হইতে দুর্ব্বল হইয়া থাকে সুতরাং দুর্ব্বল হইলে ইহারা যে কোন কালে স্বাধীন হইবে তাহার প্রত্যাশা করা বৃথা। এই বাল্যবিবাহ এদেশের দরিদ্রতার এক প্রধান কারণ"[১২]

বাল্যকালে বয়স্ক পাত্রে বিয়ে হওয়ায় অসময়ে বৈধব্য উনিশ শতকের মেয়েদের জীবনকে গ্রাস করে ফেলত। পিতার পর একমাত্র আশ্রয় স্বামীর মৃত্যুতে মেয়েদের সহ্য করতে হতো বৈধব্য যন্ত্রণা। পরিবারের বোঝা হয়ে ও কঠিন বৈধব্য পালন করে দিন কাটাতে হতো তাদের। বাল্যকালে খেলাধূলা করার বয়সে মেয়েদের এমন দুর্দশার কারণ হিসেবে লেখক ত্রৈলোক্যনাথ 'কঙ্কাবতি'-তে উল্লেখ করেছেন—

> "জামাতাদিগের বয়স কিছু অধিক পাকিয়াছিল। কারণ, বিবাহের পর, বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে, দুইটি কন্যাই বিধবা হয়।"[১৩]

বিধবা হওয়ার এই কারণ শুধু কঙ্কাবতীর বড় দুই দিদির নয়, উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় প্রায় প্রতেক মেয়েদের কাছে অভিশাপ স্বরূপ ছিল। বিধবা হওয়ার পর বাপের বাড়িতেও মেয়েদের সম্মানের চোখে দেখা হতো না। কঙ্কাবতীর দুই দিদি বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে এলে তনু রায়ের একমাত্র ছেলে তা ভালো চোখে দেখে নি। দুই দিদির দৈনন্দিন খাবার তার কাছে 'অন্নধ্বংস' বলে হতো। অথচ কঙ্কাবতীর দুই দিদি একাদশীর দিন বিন্দুমাত্র জল স্পর্শ করতে পারতো না। কঙ্কাবতীর মায়ের দুঃখের সঙ্গে জানায়—

> "গ্রীষ্মকালে একাদশীর দিন, মেয়ে দুইটির যখন মুখ শুকাইয়া যায়, যখন একটু জলের জন্য বাছাদের প্রাণ টা টা করে, বল দেখি দিদি! মায়ের প্রাণ তখন কিরূপ হয়? পোড়া নিয়ম! যে এই নিয়ম করিয়াছে, তাকে যদি একবার দেখিতে পাই, তো ঝ্যাঁটা-পেটা করি।"[১৪]

যে সমাজে নারীদের হাজার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হয়, সেখানে বিধবাদের জীবন কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। স্বামীর মৃত্যুতে আজীবন সেই পরিবারের মঙ্গল কামনায় জীবন কাটাতে হয়। বিধবাদের জীবন যেভাবে সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ হয়ে জড়রূপ নিয়েছিল, তা থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের বিরুদ্ধাচারণ করা সমকালে নারীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে উনিশ শতকে বিধবারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাত ধরে নতুন আশার আলো দেখে। নারীদের বিধব্য যাতনা থেকে মুক্তি দিতে বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। 'কঙ্কাবতী'-তে তনু রায়ের স্ত্রী বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় তার দুই বিধবা মেয়ের জীবন পুনরায় ছন্দে ফিরিয়ে আনার স্বপ্নে বুক বেঁধেছে ও ঠাকুরকে সিন্নি ভোগ দেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে।

১৮৫৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে সমাজে। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ সালের মধ্যে মোট ৬০ জন বিধবা নারীকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়েছেন তিনি। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজের বিধবা নারীদের নিয়ে প্রকাশ করা চিন্তাধারার কিছু অংশ—

> "দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন, কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য নির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে, এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভঙ্করী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবে।
>
> পরিশেষে সর্ব্বসাধারনের নিকট বিনয়বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া এবং বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, তাহার আদ্যোপান্ত বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়া দেখুন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা।"[১৫]

সময়ে সময়ে নারীর আশ্রয় বদল হয়। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্রের আশ্রয়ে নারী পালিতা হয় বলে সমাজ মনে গাঁথা। সঠিক সময়ে এই বদল না হলেই চিন্তার কারন। বাল্যকালে বিবাহ, বিশেষ করে স্বামীর বয়স যেখানে বার্ধক্যের কোঠায়, তখন অকালে বৈধব্য বা সহমরণের যাতনা নারীকে ভোগ করতে হতো। সুতরাং নারীর শিক্ষা, বাল্যবিবাহ ও সহমরণ একই সুতোয় গাঁথা। বাংলায় সতীদাহের প্রচলন দেখা যায় প্রায় দ্বাদশ শতক থেকে। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে, এর নিদর্শন রয়েছে ভুরি ভুরি। সহমরণের মাধ্যমে বংশের পরলোকের যাত্রা মসৃণ ও বংশের পুণ্য হয় বলে ধরা হতো। যে বংশের নারী সতী হয়, সেই বংশের মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ নিশ্চিত হয় এমন বিশ্বাস সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছুটতো। সতী হতে বয়সের কোনো বাঁধা ছিল না। যেকোনো বয়সের নারী স্বামীর মৃত্যুতে সতী হতে পারতো। যে সতী হতো সেই নারী সমাজের চোখে দেবী হয়ে উঠতো।

'কঙ্কাবতী'-তে ত্রৈলোক্যনাথ সহমরণের ছবি এঁকেছেন উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখেই। সতীত্বের প্রমাণ দিতে, সতীত্বকে আমরণ ধরে রাখতে ও সতী হয়ে বৈধব্য থেকে মুক্তি পেতে, স্বামীহীন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে একাধিক নারী সহমরণের পথ বেছে নিতো। এই উপন্যাসে আমরা দেখি, কঙ্কাবতী খেতুর চিতায় উঠে সতী হতে চায়। কঙ্কাবতীর উক্তি—

> "এক্ষণে আমি পতিদেহের সহিত আমার এই জড় দেহ ভস্ম করিব। সে নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, আপনারা সেই সমস্ত উপকরণের আয়জন করুন"[১৬]

কঙ্কাবতীর এমন সিদ্ধান্তের অলক্ষে রয়েছে সমাজের বেঁধে দেওয়া নিয়ম। যে কঙ্কাবতী মাছেদের রানী হওয়ার ক্ষমতা রাখে। যে যুগে সাধারণ নারীর সামান্য সম্মানটুকু জুটতো না, সে যুগে কঙ্কাবতীর রানী হওয়ার দৃশ্যটি তাকে প্রাপ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অথচ অন্যদিকে কঙ্কাবতী সমাজের অভ্যাসকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিজের সহমরণে যেতে চাওয়া ইচ্ছের মধ্য দিয়ে। সহমরণে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারীকে যে পরিমাণ সামাজিক চাপ সহ্য করতে হয় নাকেশ্বরী প্রেত্নির কথায় তা স্পষ্ট—

> "না হইলে পতিকুল পিতৃকুল, মাতৃকুল সকল কুল ঘোর কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা আত্মীয়বর্গের মস্তক অবনত হইবে। সে কলঙ্কিনী একেবারেই পতিত হইবে। তাহার সহিত যিনি আচার ব্যবহার করিবেন, তিনিও পতিত হইবেন"[১৭]

অবশেষে সতীর সাজে সেজে কঙ্কাবতী চিতায় আরোহন করে। দাম্পত্যের কল্যাণে কঙ্কাবতীর শরীরের যাবতীয় অলংকার, হাতের ভাঙ্গা চুড়ি চিতার পাশ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যায় নারীরা। সতীর সিঁদুর নিয়ে যায় সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে। কঙ্কাবতীর সহমরণের বিষয়টি বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী সকলের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠে। করন সচরাচর সহমরণ সমাজে দেখা যায় না। ত্রৈলোক্যনাথ সহমরণের বর্ননায় বলছেন—

> "বাদ্যকর দিকের ঢাক ঢোলের কোলাহলে সকলের কর্নে তালি লাগিল। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আকাশ প্রমান হইয়া অগ্নিশিখা উঠিল। কঙ্কাবতী অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। অতি সুখনিদ্রা। অতি শান্তিদায়িনী নিদ্রা"[১৮]

উনিশ শতককে অন্যান্য শতক থেকে কিছুটা ভিন্ন বলতে পারি আমরা। কারণ এই শতকেই সমাজের বুকে এক সামাজিক ভুমিকম্পের তৈরি হয়। এতে কিছু আচার, কুসংস্কার যেমন তলিয়ে যায়, তেমনি আধুনিকতার স্পর্শে নতুন চিন্তাধারার উদয় হয় সমাজে। বলাবাহুল্য এমন শুভ চিন্তার অধিকাংশই নারী কেন্দ্রিক। নানা সমাজ সংস্কারমূলক কাজের পাশাপাশি নানা সাহিত্যও রচিত হয়েছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনার সুরে। এই অন্যায় দুই রকম। মুক্তির আদর্শে দীক্ষিত লোকদের কাছে পুরনো নিয়মকে অব্যাহত রেখে গণ্ডি বেঁধে দেওয়া অন্যায়। আরেকদিকে সমাজের অধিকাংশ রক্ষনশীল মানুষের কাছে অধুনিক চিন্তায় সমাজের নিয়ম পাল্টে ফেলা অন্যায়। তবে সাহিত্যিকরা প্রথম শ্রেণীর। যারা আধুনিকতাকে সমর্থন করে মুক্তির, বিশেষ করে নারীমুক্তির আশাবাদী। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই মুক্তিকামী দলের অন্যতম। তিনি তাঁর সাহিত্যে সমকালে মেয়েদের বন্ধনকে দেখিয়ে তার থেকে মুক্তির ছবিও এঁকেছেন। তাই যে কঙ্কাবতী তার পরিবার থেকে সম্মান, ভরসা পায় নি, সে মাছেদের কাছে, গোয়ালিনীর কাছে বিশেষ হয়ে উঠেছে। কঙ্কাবতী উনিশ শতকের নারীদের প্রতীক, যাদের জীবন মসৃণ ছিল না। যাদের ভালোলাগার প্রতি সমাজ ও পুরুষের কোনো মাথাব্যাথা ছিল না। পিতার সম্পত্তি থেকে বাদ, শিক্ষা থেকে বাদ, নানা সামাজিক উন্নতি থেকে বাদ পড়তে পড়তে যাদের একপ্রকার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

মেয়েদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে আধুনিক মানসিকতার একদল লোক রক্ষণশীল গোঁড়াদের বিরুদ্ধে গিয়ে নারী-আন্দোলনে নামে। শিক্ষার আলোদান, বাল্যবিবাহ, সহমরণ থেকে মুক্তি দিতে তারা বদ্ধপরিকর হয়। নারীরাও যে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের সার্বিক উন্নতিতে যোগ হতে পারে, তা প্রমান করতে নারীদের এগিয়ে আসার সাহস যোগায় তারা। খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা এখানে উল্লেখযোগ্য। তারা নারীদের শিক্ষায় উন্নত করতে, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী পদক্ষেপ নেয়। অন্যদিকে সমাজ সংস্কারকদের হাত ধরে ১৮৭২ সালে নারীশিক্ষার অন্তরায় বাল্যবিবাহ রোধ করতে নতুন আইন চালু হয়। যেখানে ছেলেদের বয়স আঠেরো ও মেয়েদের বয়স কম মরে চোদ্দ হিসেবে ধার্য হয়। এমন আইন, সমাজের বুক থেকে বাল্যবিবাহ রোধ করতে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল। ফলে নারীরা শিক্ষা গ্রহনেও সময় পেয়েছিল, যা নারীর জীবনে আশার আলো।

নারীমুক্তির কিছু আদর্শ পদক্ষেপ সমকালের সাময়িক পত্রে প্রকাশ পায়। যা সমাজকে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেয়। যেমন--

১৮৭৭/১/১৪ 'সাধারণী' পত্রিকায় প্রকাশ পায়—

> "এবার সিন্ডিকেট অনুগ্রহ করিয়া শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু নাম্নী একটি দেশীয় খ্রীষ্টান রমণীকে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষা দিতে অনুমতি প্রদান করেন। চন্দ্রমুখী দ্বিতীয় শ্রেনীতে উত্তীর্ন হইয়াছেন। ইতি ইংরেজি, পারস্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ও বীজগণিতে পরীক্ষা দেন"[১৯]

'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকা, আশ্বিন, ১২৮২—

> "অতি প্রাচীন সময় হইতে আমাদের স্ত্রী লোকেরা চিকিৎসাবিদ্যা শিখিয়া আসিতেছেন। আমাদের পিতামহী ও মাতামহীরা আজিপর্যন্ত আবশ্যক হইলে আমাদিগকে ঔষধপত্র দেন। এখনকার

স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পূর্ব্বকালীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় গৃহিণী হউন, এই আমাদের প্রার্থনা"[২০]

স্ত্রী-দের কিংবা নারীদের শিক্ষা হাতের কাছে এলেও সংসারে একজন গৃহিণীর চাহিদা থেকেই যায়। তাই ঘরের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগৎ সামলানোর দায়িত্ব নারীর হাতে ধীরে ধীরে আসতে থাকে। এভাবে নারীর সাদামাটা জীবন আধুনিকতার হালকা স্পর্শে নতুন দিগন্তের দিকে বাঁক নেয়।

তথ্যসূত্র:

১. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ৩২।
২. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ১১৮।
৩. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ৩২।
৪. বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ(সম্পা)। উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি। পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা- ২০০।
৫. ঘোষ, বিনয় (সম্পা)। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (তৃতীয় খণ্ড)। বীক্ষণ, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৬০ খ্রি., পৃষ্ঠা- ৫৪২।
৬. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ১৬।
৭. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ৫৭।
৮. সাহা, নির্মলকুমার (প্রকাশক)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ৭২
৯. সাহা, নির্মলকুমার (প্রকাশক)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ৭২
১০. সাহা, নির্মলকুমার (প্রকাশক)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ৭৯
১১. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ৮০।
১২. বসু, স্বপন (সম্পা)। বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস। পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা- ২৭৮।
১৩. সাহা, নির্মলকুমার (প্রকাশক)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ১৫।
১৪. সাহা, নির্মলকুমার (প্রকাশক)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ২৬।
১৫. বসু, স্বপন (সম্পা)। বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস। পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা- ১৩০।
১৬. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ১১৫।
১৭. সাহা, নির্মলকুমার (প্রকাশক)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ১৫৬।
১৮. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ১৫৯।
১৯. বসু, স্বপন(সম্পা)। সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি নারী। বুকস স্পেস, পৃষ্ঠা- ২৯৯।
২০. বসু, স্বপন(সম্পা)। সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি নারী। বুকস স্পেস, পৃষ্ঠা- ২৯৯।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকরগ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, সুদেব (সম্পা)। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী। কামিনী প্রকাশালয়, পঞ্চম সংস্করন-২০১৫, ডিসেম্বর।
২. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী' (১ম ও ২য় খণ্ড), সাহিত্যম্।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ঘোষ, বিনয় (সম্পা)। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (তৃতীয় খণ্ড)। বীক্ষণ (কলকাতা), প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৬০ খ্রি.।
২.বসু, স্বপন (সম্পা)। সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি নারী। বুকস স্পেস (কলকাতা)।
৩. বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ (সম্পা)। উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি। পুস্তক বিপণি (কলকাতা)।
৪. বসু, স্বপন (সম্পা)। উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র। পুস্তক বিপণি (কলকাতা)।
৫. বসু, স্বপন (সম্পা)। বাংলার নবচেতনার ইতিহাস। পুস্তক বিপণি (কলকাতা)।